পঞ্চম অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পে নিসর্গের মানবিক পরিপ্রেক্ষিত

বুদ্ধদেব বসু তাঁর গল্পে নিসর্গের মানবিক প্রেক্ষিত বর্ণনায় আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দেখিয়েছেন। 'জ্বর', 'একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা', 'সুপ্রতিম মিত্র', সহ আরো অন্যান্য গল্পে নিসর্গকে নানা মাত্রায় ব্যবহার করেছেন তিনি। সবক্ষেত্রেই নিসর্গের সঙে মানুষের সম্পর্কের একটা পটভূমিকা তিনি বজায় রেখেছেন। তাঁর গল্পে নিসর্গ কখনো প্রকৃতরূপে অবস্থান করেই মানুষের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে আবার কখনো মানবহৃদয়ে ব্যাকুলতার সঞ্চার করে চিত্তে অনন্তের স্পর্শ এনে দিয়েছে। বুদ্ধদেব তার গল্পে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের কাব্যিক ও কাল্পনিক আত্মীয়তার-বন্ধন স্বীকার করেছেন, প্রকৃতির মধ্যে অনন্তের স্পর্শকেও গ্রহণ করেছেন।

'জ্বর' গল্পে অবসন্ন রমাকান্ত বসুর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিসর্গকে ব্যবহার করেছেন লেখক। আলোচ্য গল্পে আমরা দেখি রমাকান্তের জ্বর বেঁধেছে এবং সে বিকারের ঘোরে নানান স্বপ্ন দেখে— সে দেখে যে সে মরে গেছে এবং অনেক লোকের কাঁধে চড়ে সে শ্মশানে গেছে। এবং তখনই সে দেখে— ''শ্মশান তো নয়, দেওঘর। সবে সকাল হইয়াছে। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ নীল আকাশের গায়ে সূর্যের প্রথম রক্ত-রশ্মি সহস্রখণ্ড হইয়া ভাঙিয়া গেল। কাঁকর-ভরা পথ অজস্র অশোকে লাল হইয়া গেছে;— ঘন-অশোকগুচ্ছে দিগন্তরেখা গাঢ় রক্তবর্ণে উদ্ভাসিত। সে আর সুধা নন্দন পাহাড়ের দিকে চলিয়াছে। বাসন্তী রঙের শাড়িখানা সুধার গৌরতনুকে সস্নেহে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে; যদিও পথে যতদূর দৃষ্টি যায়

আগে-পাছে একটি প্রাণীও নাই, তবুও তাহারা নিম্নস্বরে আলাপ করিতেছে।”[১]

আবার ‘সুপ্রতিম মিত্র’ গল্পে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রকৃতি নতুনভাবে ধরা পড়েছে— ‘‘গাছের নিচে একটি বেঞ্চিতে বসে চারিদিকে তাকালুম, চির-পুরোনো দারজিলিং হঠাৎ যেন নতুন হয়ে চোখে লাগল। অক্টোবরের শেষে প্রায়ই কুয়াশায় আকাশ ও পৃথিবী মুছে যায়, কিন্তু আজকের বিকেলটি টলটলে উজ্জ্বল, আর হাওয়ায় সেই বিশিষ্ট পাহাড়ি শৈত্য, যা জীর্ণ দেহে নবজীবন আনে। আজকের রোদে যেন একটি নতুন আভাস। আজকের আকাশ যেন একটি নতুন আভা, আজকের আকাশ যেন অন্য সবদিনের আকাশের চাইতে নীল। বেশ বিকেলটি।”[২] সে আবার বলে— ‘‘হয়তো আজ দারজিলিং-এ একটি বাড়ির মালিক হয়েছি বলেই এখানকার প্রকৃতিকে সুন্দর লাগছে আমার।”[৩]

প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেব একজন সৌন্দর্য প্রেমিক কবি; সেটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হোক আর কোন নারীর দেহের সৌন্দর্য; তাঁর রচনায় বারবারই কোথাও না কোথাও এই সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি। কবি মাত্রেই প্রকৃতি সচেতন। রবীন্দ্রকাব্যেও বারবার প্রকৃতির হাতছানি লক্ষিত হয়— ‘‘যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে/ সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া/ ওরে বিহঙ্গ, বিহঙ্গ মোর/ এখনি অন্ধ বন্ধ কোর না পাখা।”[৪]

এই প্রসঙে স্মরণে আসে সমালোচক আবু সয়ীদ আইয়ূবের মন্তব্য : ‘‘প্রেম ও প্রকৃতির মধ্যে এই যে অধরা সুক্ষ্ম ইঙ্গিত তাকেই আরও ইঙ্গিতময় ও প্রত্যক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।...গীতাঞ্জলি পড়বার সময় সবিস্ময়ে অনুভব করি আমরা যেন দুই জগতের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা ধরে হাঁটছি, একটু এদিকে, সরলে পা পড়ে মর্ত্যলোকের মাটিতে, একটু ওদিকে সরলে পাই অমৃতলোকের গন্ধ।”[৫]

প্রকৃতিকে নিয়ে যে বা যারা কবিতা, গল্প, উপন্যাস রচনা করেছেন তাদের সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছিলেন— ''এক হিসেবে সকল কবিই প্রকৃতির কবি, একথা পূর্বে বলেছি। কিন্তু সকল কবিকেই ঐ আখ্যা দেওয়া যায় না, কারণ সকলের পক্ষেই প্রকৃতি একমাত্র কিংবা প্রধান বিষয় নয়। অনেক কবির পক্ষে প্রকৃতি মানব জীবনের নানা অভিজ্ঞতার পটভূমিকা, অনেকের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিলাস, আবার কারও কারও পক্ষে আমাদের মনের অবস্থার প্রতিরূপ মাত্র।''[৬]

বুদ্ধদেবের 'তুলসীগন্ধ' ও 'একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা' গল্প দুটির কেন্দ্রে আছে একটি বটগাছের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি। 'তুলসী গন্ধ' গল্পে আছে এক বিবাহিত তরুণীর কণ্ঠ আর 'একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা' গল্পে আছে অবিবাহিত ও প্রণয়ে অসার্থক এক তরুণের কণ্ঠ। 'একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা' গল্প যেখানে শেষ হয়েছিল 'তুলসী গন্ধ' গল্প তারপর থেকে শুরু হয়েছে। নাম পালটেছে কিন্তু ধাম বদলায়নি। 'তুলসী গন্ধ'-র মেয়েটির সম্পর্কে বলা হয়েছে যেন সেদিনের কোনো স্মরণচিহ্ন, কোনো অভিজ্ঞান সে বহন করছিল নিজের মধ্যে। গল্পটিতে দেখা যায় মেয়েটি অর্থাৎ কমলা তার পুরোনো পাড়াতে গিয়ে তাকিয়ে রইল। সে তার পাড়াটাকে চিনতেই পারছিল না। পাড়ার ঠিক প্রান্তবর্তী এলাকায় নাকি একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, সেখানে এখন খাঁ খাঁ করছে। এই জায়গাটা খালি দেখে তার মনে পড়ে যায় পুরোনো স্মৃতি— ''একদিন এই সমস্ত জায়গাটা ছিলো বন; শহর থেকে দুঃসাহসী স্কুলের ছেলে এখানে বেড়াতে এসে সন্ধে হবার আগেই বাড়ি ফিরে যেত। সেই সময় থেকে আরো কত, কত আগে থেকে :— সেই বটগাছ রাজত্ব করেছে এখানে; পাখিতে, পতঙ্গে, পল্লবে, লতায় বিচিত্র প্রাণময় এক জগৎ, আকাশের দিকে বিশাল ডালপালা মেলে দিয়ে সূর্যকে সে পান করেছে আর বৃষ্টিকে

সূর্যের শক্তিকে সে প্রেরণ করেছে তার দেহের অন্ধকারে লীন লক্ষ-লক্ষ তন্তুতে, বৃষ্টির উজ্জীবনকে সে প্রস্ফূটিত করেছে নতুন, সবুজ পাতার ঐশ্বর্যে। সেই সমস্ত প্রাণ, প্রাণের ক্লান্তিহীন, ক্ষান্তিহীন লীলা হঠাৎ একদিন শেষ হয়ে গেলো। এই বনদেবতার পতনের সঙ্গে সঙ্গে কী ভীষণ আর্তনাদ হয়তো উত্থিত হয়েছিল। কমলা যেন নিজের মধ্যে সেই কান্না শুনতে পেলো— আকাশ ফাটানো সেই মৃত্যু-চিৎকার।"[৭]

আবার, 'একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা' গল্পে মৌলিনাথের প্রেমিকার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের মুহূর্তটি অভিব্যক্তি পেয়েছে ঐ বটগাছের আদ্যকল্প চিত্রে : "আবছা আলোয় বটগাছটায় বিরাট অস্পষ্ট মূর্তি চোখে এসে লাগলো। তার লক্ষ পাতা থেকে লক্ষ লক্ষ জলের ফোঁটা টপ টপ করে ঝরে পড়ছে— সারা রাত ধরে ঝরবে— কানে না শুনেও মৌলি সে শব্দ মনে মনে শুনলো। এই গাছ ওরা কেটে ফেলবে, বোবা হয়ে যাবে মাঠ, বিধবা হবে দৃষ্টি, বর্ষার তানপুরাতে একটা তার ছিড়ে যাবে। 'আমি-আমিও আর এখানে থাকব না।' মৌলি মনে-মনে বললো, 'আমিও চলে যাবো'।"[৮] আসলে এই বটগাছের সাথে মৌলির একটা সুনিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই বটগাছের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে কত কত কবিতা লিখেছে এবং পড়েছে— "সকালবেলাটি তবু সুন্দর, তখনও সুন্দর। মাঠের মধ্যে বটগাছটার অসংখ্য পাতাগুলি ঝর ঝর করছে হাওয়ায়, ঝল মল করছে রোদ্দুরে— বেগুনি সোনালি শাদা, হলদে নীল সবুজ, নানা রঙের ঢেউ উঠছে, ঢেউ পড়ছে। সেই বটগাছের ধার দিয়ে বেঁকে গিয়ে ঘোড়ার গাড়িটি পাকা রাস্তায় পড়লো— নীল শাড়ির আভাসটুকু আর দেখা যায় না। মৌলি মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিলো দরজার ধারে।"[৯]

উক্ত গল্পটিতে দেখি ঢাকা শহরের এক তরুণ তার মাকে নিয়ে কুটির

বেঁধে থাকত, থাকত প্রকৃতির মধ্যে উদাসীন হয়ে এক তরুণী তাকে ভালোবেসেছিল তার খবর সে রাখত না। এই তরুণ যুবকটির নাম মৌলিনাথ। সে খুব ভালো কবিতা লেখে এবং এই কবিতাই হচ্ছে তা জীবিকার মূল উপায়। গল্পটিতে বুদ্ধদেব অতি সুন্দরভাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নানা দিক মৌলিনাথের চোখ দিয়ে আমাদেরকে দেখিয়েছেন। গল্পটি শুরু হয়েছে এভাবে ''সকালবেলাটি জ্যোর্তিময় হয়ে দেখা দিলো। কাল রাত্রে যে বৃষ্টি হয়েছিলো আকাশে তার চিহ্নমাত্র নেই, বাতাসে আছে তার স্মৃতি। আজ আকাশ কূলে-কূলে নীল, কানায় কানায় উজ্জ্বল, দিগন্ত থেকে দিগন্ত অবারিত। মস্তক নগ্ন উন্মুক্ত আকাশটার কোনখানে একফোটা সাদা মেঘও লেগে নেই। তীব্র তপ্ত রোদ্দুরে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে, সে তাপে তেজ আছে ক্লেশ নেই। কেননা হাওয়া এখনো গরম হয়ে উঠতে পারেনি, কালকের বৃষ্টির স্পর্শটুকু এখনও সে ছড়িয়ে দিচ্ছে পৃথিবী ভরে। আশার যদি কোনো রূপ থাকতো উৎসাহের যদি কোনো ছবি হতো, এই সকালটি যেন তা-ই।''[১০] গল্পটির মধ্যে অতি সুন্দর এক প্রাকৃতিক দৃশ্যের পটভূমি রচনা করেছেন লেখক। উত্তরেও পূর্বে দেখা যায় গাছপালার গ্রাম্য শ্যামলিমা। ছোট একটি একতলা বাড়ির একটি ঘরের মধ্যে সারা আকাশ যেন গুণগুণ করে গান করছে, আলোর বান ডেকেছে, হাওয়া বইছে ঝিরিঝিরি, আর টেবিলে বসে মৌলিনাথ জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। অপরূপ সকাল বেলাটির নীরব গুঞ্জন যেন ধ্বনি পেয়েছে, ভাষা পেয়েছে তার মুখে। সকালবেলার অপরূপ সৌন্দর্য্য মনের মলিনতাকে দূর করে মনকে পবিত্র করেও দেখার দিগন্তকে বাড়িয়ে দেয়। আমাদের এই গল্পের নায়ক মৌলিনাথের কাছে তাই সকাল বেলা অপরূপ— ''কী সুন্দর আজ সকাল বেলাটি, ঘুম ভেঙে যেই বাইরে তাকিয়েছি অমনি একটা সুখের

ঢেউ যেন আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। এইরকম আলো আর আকাশ, আর এইরকম সকালবেলা— জীবনকে পরিপূর্ণ করতে এর বেশি আর কী চাই!"[১১] তার মুখে আবার ধ্বনিত হতে শুনি— "সকালবেলাটি তবু সুন্দর, তখনও সুন্দর। মাঠের মধ্যে বটগাছটার অসংখ্য পাতাগুলি ঝরঝর করছে হাওয়ায়, ঝলমল করছে রোদ্দুরে বেগুনি সোনালি সাদা, হলদে নীল সবুজ, নানা রঙের ঢেউ উঠেছে, ঢেউ পড়েছে। সেই বটগাছের ধার দিয়ে বেঁকে গিয়ে ঘোড়ার গাড়িটি পাকা রাস্তায় পড়লো— নীল শাড়ীর আভাসটুকু আর দেখা যায় না।"[১২] মৌলিনাথ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে দরজার সামনে এই অপরূপ দৃশ্য দেখছিলো, সে ফিরে এসে গুণগুণ করতে লাগল—

"I will go back to the great sweet Mother
Mother and lover of men, the Sea.
I will go down to her, I and none other,
Close with her, kiss her and mik her with
Cling to her, strive with her, hold her fast
O Fair white mother —"[১৩]

গলা বুজে এলো, আর পড়া হলো না। মৌলি দু'হাত দিয়ে বইখানা জড়িয়ে বইয়ের পাতায় মুখ ঢাকলো। এভাবেই বুদ্ধদেব বসু বারবারই তার গল্পগুলোতে বাস্তবের ক্লান্তি দূর করার জন্য নিস্বর্গের স্মরণাপন্ন হয়েছেন। বুদ্ধদেবের এরকমই আরেকটি গল্প হলো 'তুমি কেমন আছো'। গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র অবনীশ ঘোষাল বার্লিনে পাশ করা এবং ডেট্রয়েটেড ফোর্ডের কারখানায় হাত পাকানো ইঞ্জিনিয়র। পিপ্পল গড়ের ইস্পাত কারখানায় নিযুক্ত প্রধান ব্যক্তিদের

একজন তিনি। তার দৈনন্দিন কর্মব্যস্ত জীবন, স্ত্রীর অলস ও সামাজিক দিন যাপন এবং উভয়ের অবসর বনোদনের বর্ণনা প্রকট করে অবনীশের একান্ত নিঃসঙ্গতা উসকে দেয় বিমূর্ত নারীর প্রতি প্রেম। ঘোষাল সাহেব দৈত্যের মতো খাটেন আটাটা থেকে আটটা তার রুটিন। এই রুটিন মেনে চলতে চলতে অবনীশবাবু এখন বিশ্রাম চাইছেন— ''মাঝে মাঝে আমার মন চায় বিশ্রাম। কোনো কাজ না— কিছুই না— কোথাও কোনো বারান্দায় বসে আছি বেতের চেয়ারে, সামনে সমুদ্র। নীল সবুজ বেগুনি রঙ চঞ্চল জল, ঢেউয়ের পর ঢেউ, ধবল পাখি, ধবল রৌদ্র, ঝাপসা দূর। আমি বসে আছি বেতের চেয়ারে, দেখছি। ছুটি; বিশ্রাম; যা-কিছু নিয়ে যাকে বলে জীবন, সব ভুলে থাকা। নিই না কেন? আমার মনের কথাটা বলে ফেলি আপনাদের, আপনারা হাসবেন না, সন্দেহের চোখে তাকাবেন না আমার দিকে। কী বিশাল হবে সেই দিন, যে দিনে কোনো কাজ থাকবে না! কী বিরাট সেই লঘুতার ভার যাতে ছুটি ছাড়া আর কিছু নেই।''[১৪]

গল্পটিতে আরেক জায়গায় দেখি অবনীশবাবু তার মনের প্রেয়সীর ছবি আকতে গিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্মরণাপন্ন হয়েছেন— ''অরুণবর্ণ ঊষা তোমার মুখোমুখি আর আমি আছি তোমার দিকে তাকিয়ে, আমার পায়ে শিশিরের ছোয়া, আর ভোরবেলার পুলক আমার শরীরে। তন্বী তুমি, শুভ্রা, নরম রোদে নীল আর বেগুনি রঙা তোমার চুল। টুকটুকে লাল তোমার গায়ের জামা, ধবল শাড়ীতে লাল পাড় জড়িয়ে আছে। আলোর মতো আলো করে আছো জগৎ, তোমারই গন্ধ টাটকা সবজু বাতাসে। আমার আলো, আমার প্রাণ, আমার আত্মা, কেমন করে এটা হলো যে আমি তোমাকে হারিয়ে ফেললাম।''[১৫] গল্পশেষে আবার দেখি— ''কোথায় সেই দেশ, সেই সমুদ্র, সেই নীলিমা? যেখানে তুমি আছো, সেখানে। ভরা ষোলো

তুমি, গায়ে আমার শিশিরের গন্ধ, মুখ তোমার গোলাপি রোদে উজ্জ্বল, আলোর মতো আলো করে আছো এই জগৎ।”[১৬]

গল্পটিতে দেখি সময়ের সঙ্গে যান্ত্রিক জীবন যাপন করে চলেছেন অবনীশ ঘোষাল। অতীতের নান্দনিক অবলোকন গল্পের ভাঁজে ভাঁজে মৃদু সুঘ্রাণ ছড়িয়ে দেয়। বুদ্ধদেব গল্প না বলে গল্পের আঙ্গিকে একটি শিল্পসফল কবিতা শুনিয়েছেন, যেখানে গল্প পড়তে পড়তে মনে হবে একটি প্রেমের কবিতা পড়ছি, প্রেমিকা যেখানে চির অপ্রাপ্য। আবার কবিতা পড়তে পড়তে মনে হবে একটি গল্পের দীঘল ছায়ায় রয়েছি, যে গল্পে অস্তিত্বমান নায়িকা নেই, আবার সেই থাকা-না-থাকা নায়িকাই গল্পের মৌলবিন্দু। এটি একটি অসফল প্রেমের সফল গল্প। ইস্পাতের অবনীশ, উৎপাদনের অবনীশ, কঠোর শৃঙ্খলার অবনীশ, রাষ্ট্রীয় মুদ্রাঅর্জনের অবনীশ, উজ্জ্বল সামাজিকতার অবনীশ, এসব বহুমাত্রিক অবনীশের অবচেতনে একজন অন্য অবনীশ মুখর হয়ে ওঠেন কবি বুদ্ধদেবের স্বপ্নকাতর সত্তা নিয়ে। কাবেরী-সিন্ধু-নর্মদায় অজস্র জলরাশি বয়ে যায়, কিন্তু অবনীশের প্রেমিকা ষোড়শী স্তর অতিক্রম করেন না। অবনীশের শরীরে যদিও চিহ্ন রেখে যায় বয়সের আঁচড়। ত্বক ক্রমশ শিথিল হতে থাকে। টাক মাথায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিতে থাকে। হাসির কৃতিত্ব সমস্ত কেড়ে নেয় কৃত্রিম দন্তরাশি। পিপ্পলগড়ের সবাই যাকে সমীহ করতে থাকে, সেই অবনীশ মাংস-মেদ-ময়লার এক জীবন্ত পিণ্ড। তার প্রেমিকা অনন্তকাল ধরে অজরা, যিনি বার্ধক্যের কাছে চির অপরাভূতা, যিনি বড়ো হন, কিন্তু বুড়ো হন না। যিনি তার আলো, তার প্রাণ, তার আত্মা, সেই অন্তরতমার সঙ্গে অবনীশের একদিন নির্মম বিচ্ছেদ ঘটে—

"সেদিন সকালে তুমি ছিলে বাগানে। শিশির, ঘাস, কাঁচা নরম গোলাপি রোদে, টাটকা সবুজ নরম গন্ধ বাতাসে। ভরা ষোলো তুমি, তন্বী, শুভ্রা-আমার ছেলেবয়সের মন বলেছিলো সরস্বতী। টুকটুকে লাল তোমার গায়ের জামা, ধবল শাড়িতে লাল পাড় জড়িয়ে আছে; আলোর মত তুমি, আলো করে আছো জগৎ। ...তোমাকে কোনো কথা কি আমি বলেছিলাম— যখন ঘাসে শিশির, বাতাসে গন্ধ আর ভোরের মুখে গোলাপি রোদ ছড়ানো? তুমি বলেছিলে কি আমাকে? মনে পড়ে? মনে পড়ে না? তুমি এসে দাঁড়ালে সিঁড়িতে অরুণবর্ণ ঊষা তোমার মুখোমুখি; আর আমি আছি তোমার দিকে তাকিয়ে, আমার পায়ে শিশিরের ছোঁয়া, আর ভোরবেলার পুলক আমার শরীরে। তন্বী তুমি, শুভ্রা, নরম রোদে নীল আর বেগনি-রঙা তোমার চুল। টুকটুকে লাল তোমার গায়ের জামা, ধবল শাড়িতে লাল পাড় জড়িয়ে আছে, আলোর মতো আলো করে আছো জগৎ, তোমার গন্ধ টাটকা সবুজ বাতাসে। আমার আলো, আমার প্রাণ, আমার আত্মা, কেমন করে এটা হল যে আমি তোমাকে হারিয়ে ফেললাম।"[১৭]

অবনীশ কেবল পরিভ্রমণপ্রিয়, বিলাসপ্রবণ জীবনে অভ্যস্থ কর্মনিপুণ এক পেশাজীবী নন। প্রকৃতপক্ষে তিনি অন্তর্গত জীবনচর্যার একজন ভিন্ন মানুষ। দৈনন্দিন জীবনের অনিবার্য কর্মশৃঙ্খলায় বন্দী অবনীশ সৌন্দর্যের প্রবল পিপাসায় তার স্বপ্নকে দেখতে চান নির্ভার এবং মুক্তধারার মত বহমান। দিন মোর কর্মের প্রহারে পাংশু/রাত্রি মোর জ্বলন্ত জাগ্রত স্বপ্নে (রূপান্তর)। দিন কর্মের প্রহারে পাংশু হলেও জাগ্রত স্বপ্ন এর সম্ভারে রাত্রি আলোকিত হয়, কবি বুদ্ধদেবের এমন স্বপ্নচেতনা গল্পকার বুদ্ধদেব মধ্যে প্রোথিত হয় প্রবলভাবে। বুদ্ধদেব বসুর কবি-আত্মার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় গল্পটিতে, যেখানে অবনীশ কর্মগত অবসাদ ও

ক্লান্তির করুণ ছোঁয়া থেকে তার অন্তর্গত অবনীশকে সুরক্ষা দিয়ে থাকেন। নিসর্গমুগ্ধতার সঙ্গে একজন মানুষের জন্য আরেকজন মানুষের হাহাকার কতটা মর্মস্পর্শী হতে পারে, বুদ্ধদেব তার চারুভাষ্যে তা দেখিয়েছেন। যার জন্য নিসর্গ অসহ্য সুন্দর হতে পারে, যার চোখে কত জন্ম মৃত্যু কেঁপে কেঁপে যায়, যার জন্য একজন প্রেমিক তৃপ্তিহীন। মুগ্ধপ্রেমিকের দৃষ্টিতে একজন প্রেমিকা কেবল প্রেমিকের হৃদয় নয় সমগ্র পৃথিবী আলো করে থাকেন। প্রেমিকা মর্ত্যজনোচিত মানবী নন; তিনি দিব্যরূপিনী। সেই দিব্যরূপিনীর সংস্পর্শে রোদ শুরু রোদ নয় গোলাপি রোদ, বাতাস শুধু বাতাস নয় টাটকা এবং সবুজ বর্ণখচিত। এ গল্পের নায়ক-নায়িকা দু'জনই সমান্তরাল বিশ্ব নাগরিক। মানচিত্র থেকে মানচিত্রে পরিব্রাজন তাদের জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ। সুন্দরীদের মুখে মুখে প্রেমিকার মুখ দেখে চমকে উঠেন অবনীশ। পৃথিবীর প্রতিটি সুন্দরীর মধ্যে লুকিয়ে আছেন তার দিব্যরূপিনী! সংশয়, বিষাদ, ক্লান্তি, নৈঃসঙ্গ প্রেমিকের অনুভকে বাঙ্ময় করে তোলে—

"তোমাকে শেষ দেখেছিলাম কবে? চল্লিশ বছর আগে? দু-চার বছর আগে? গতকাল? ঠিক মনে পড়ে না। অনেক বার অনেক দেশ ঘুরে এখন ভুল হয়ে যায় কোনটা কোন দেশ, কোনটা কোন সময়। পাহাড়ের চূড়োয় বাংলোবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখেছিলাম— সে কি ম্যানিলায়, না কাপ্রিতে? কোথায় সেই সরাইখানা যেখানে ছিলো গনগনে কাঠের আগুন, সেকেলেও স্বল্প আসবাব, সুস্বাদু শাদাশিধে খাবার, স্নিগ্ধমদ, আর বাইরে বরফ-পড়া রাত্রি, নিশ্বসিত হিম অরণ্যে? টিরল? ডেনমার্ক? না কি বিগ্‌সুর? আর সেই যেবার গাড়িতে যেতে-যেতে তোমাকে দেখেছিলাম— সে কি মাইসোর থেকে উটকামণ্ডের পথে,

না কানাডায়, না কি স্কটল্যান্ডে? ওইরকম কোথাও হবে, হয়তো অন্য কোথাও হতে পারে। যাচ্ছি গাড়িতে, ঠিক পাশে-পাশে আর একটি চলেছে। উজ্জ্বল দিন, দুইদিকে বড়ো-বড়ো গাছ, পথের উপরে আলোছায়ার খেলা। একটা নীল রঙের ইটালিয়ান ফিয়াট, সেটাতে তুমি। তোমার পাশে একটি সুশ্রী যুবক, তার সুচারু গোঁফ দেখে তাকে মনে হয় এরোপ্লেনের পাইলট, অথবা কোনো নামজাদা খেলোয়াড়। ভরা ষোলো তুমি, লাল জামা তোমার গায়ে আলোর মত, আলো করে আছো সেই দিনটিকে। অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম তোমাকে, তারপর নীল ফিয়াট অন্য পথে বেঁকে গেলো। ... সেবারে আমস্টার্ডামে হোটেলের লিফটে হঠাৎ দেখেছিলাম তোমাকে। স্ল্যাক্স পরেছো, গায়ে উজ্জ্বল লাল উলের কার্ডিগান, তোমার ভরা-ষোলো চোখে-মুখে প্রফুল্ল। যে মেঘলা দিন বাইরে ছড়ানো ধূসর, তাকে আলো করে তরুণী তুমি দাঁড়ালে। দেখে চিনলে আমাকে, হাসলে; আমি কী-একটা তুচ্ছ কথা বলামাত্র জবাবা দিলে জর্মান ভাষায়। আমার আগে নেমে গেলে তুমি; তারপর আর তোমকে দেখলাম না। ভুল? হয়তো হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ভুল। এতদিন ধরে ষোলো বছরে তো থাকতে পারো নাতুমি। আর যদি তুমিই হবে তবে চুল কেন সোনালি? আমকে চিনতে পেরেও জর্মানে কেন কথা বলবে? কিন্তু সে যদি তুমি না— হয়ে থাকো, তাহলে তুমি কোথায়?”[১৮]

গল্পটির শেষে একটি স্নিগ্ধ হাহাকার জেগে ওঠে। স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের বেদনা পাঠককে শুরু থেকে শেষ অবধি মুগ্ধ করে রাখে। শব্দের যোজনা, ব্যঞ্জনাবাহী চিত্রকল্প, নাটকীয়তাঘন মুহূর্ত এবং গীতলতার মূর্ছনায় গল্পের আবেদন ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

কবিতাপ্রধান এই গল্পে নাগরিক অনুষঙ্গ কিংবা বৈশ্বিক অনুষঙ্গ আত্মস্থ

করে নিসর্গমুগ্ধতার জয় হয়েছে। অনুভূতি প্রকাশে নিসর্গের আবহে একেকজন পাঠক একেকজন স্বপ্নকাতর অবনীশ হয়ে ওঠেন, যিনি একজন গল্পকথক, যার ভাষা ঘটনাউদঘাটক বিবৃতি নয়। যিনি বুদ্ধিশাসিত মননশীলতার পরিবর্তে হৃদয়শাসিত মননশীলতায় বিশ্বাসী, যার ভাষা কর্কশ পাথর ফুঁড়ে কবিতার অবিরল ঝরনাধারা। পারিবারিক জীবন, পেশাগত জীবনসহ সর্বত্র সরব সম্পৃক্ত থেকেও অবনীশ স্বেচ্ছাবিচ্ছিন্নতায় মগ্ন। অতিমাত্রায় যান্ত্রিক জীবন কি অবনীশের স্বেচ্ছাবিচ্ছিন্নতার মুখ্য কারণ। নাকি চিরঅপ্রাপ্যর জন্য অনন্ত অন্বেষণ? শিশির, গোলাপ, রৌদ্র, সুমদ্র, নীলিমা, ঢেউ, জল, বাতাস, রঙ, আলো এসব নৈসর্গিক উপাদান উপকরণ সমন্বয়ে যে কল্পপ্রতিমার অবয়ব গড়ে তুলেছেন গল্পের শরীর জুড়ে, অবনীশের সেই প্রতিমা লোকান্তরবাসিনী। আত্মকেন্দ্রিক স্বপ্নলোকের বাসিন্দা অবনীশ যেতে চান সেখানে, যেখানে সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ নেই, নেই বুদ্ধজনিত ক্লান্তি ও কালিমা। সেই সমুদ্রসমীপে, নীলিমার নিচে যেখানে তার অনন্তযৌবনা শ্বাশত 'তুমি' অবারিত সৌন্দর্য নিয়ে তাকে হাতছানি দেন নিরন্তর। বুদ্ধদেব কবিতা, গল্পের এক অপূর্ব সমন্বয় করেছেন গল্পটিতে।

বুদ্ধদেব গল্পকে কবিতার কাছাকাছি কখনো কখনো গল্প-কবিতার সুষম মিশ্রণে নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। গল্পের চরিত্রচিত্রণ এবং আবহ নির্মাণের ফাঁকে মাঝে মাঝে জেগে ওঠে তাঁর কবিসত্তার অদম্য প্রকাশ। আধুনিক কবিতার দূরবর্তী পাঠক গল্পের সঙ্গে অগোচরে কবিতার পাঠক হয়ে ওঠেন বুদ্ধদেবের কলানৈপুন্যে। কবিতার জন্য একজন কবির দুঃখ সরল অভিঘাতে ফুটে উঠেছে 'খাতার শেষ পাতা' গল্পে। একজন তরুণ কবি জীবিকার প্রয়োজন আবর্তিত হতে হতে এমন এক অবস্থানে ঠাই নিয়েছেন, যেখানে স্বপ্ন নেই, সৌন্দর্য নেই এবং

নেই কবিতাও। কবিতা তার কাছে এখন চেনা ঘরের অচেনা প্রতিবেশী। কবিতার জন্য এক কবি আর্তনাদ করতে থাকেন :

''রাত বাড়লো, চাঁদ পশ্চিমে। এতক্ষণ সে কী করেছে? ছাইদানে জমেছে অনেকগুলি আর খাতার পাতায় অসংখ্য বিচিত্র কাটাকুটি ক্রমশ একটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর আকৃতি ধারণ করেছে। নেই কথা সেই। তার মুখ থেকে উঠলো, চোখ দুটো বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে, দাঁতে দাঁতে চেপে নির্মম প্রতিজ্ঞার শরাসনে সে চুপ করে বসে। আছে, আছে সে হারায়নি— তাকে ফিরিয়ে আনবো। লুকিয়ে আছে সে এই রাত্রির বুকের তলায়, ছড়িয়ে আছে তারায়-তারায়, মিশে আছে আমারই হৃদয়-রক্তে। সে আছে সে যায়নি, সে এখনি আসবে।''[১৯] যে কবি কবিতার স্বপ্ন দিয়ে কৈশোর অতিক্রম করেছেন কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি দিয়েই তিনি পূর্ণ করবেন জীবনের জয়গাথা। জীবিকার সীমাহীন বাসনা তাকে এক সময়ে কবিতাচ্যুত করে। কবিতামুখর জীবন হারিয়ে জীবিকামুখর জীবনের মুখোমুখি হতে হয়। জীবিকার মূল্যে জীবনকে বিকিয়ে দেবার অমানুষিক ব্যবস্থার ফলেই কবিদের জীবনে নিঃসঙ্গতা বিরাজ করে। 'জয়জয়ন্তী', 'খাতার শেষ পাতা', 'অনুদ্ধারিণীয়' গল্পের তিন কেন্দ্রীয় চরিত্রই কবি, যারা অসহায়, ক্ষুব্ধ এবং একই সঙ্গে স্বপ্নকাতর। 'খাতার শেষ পাতা' গল্পের একটি চরণে দেখি ক্ষুব্ধ ও অসহায় এক কবির নিস্বর্গের কাছে আবদার— ''আকাশের স্তব্ধ চাঁদ লেকের জলে অপ্সরী হয়ে নেমেছে। ওই আকাশ একদিন তার ছিল; এই হাওয়া একদিন গান হয়ে তার বুকে দোলা দিয়েছে। আর তার কিছুই কি বাকি নেই।''[২০] 'জয়জয়ন্তী' গল্পে বুদ্ধদেব বসু একটি বিচিত্র প্রেমের আদল গড়েছেন। এই গল্পের নায়ক একজন কবি। গল্পটিতে দেখি নায়িকা তন্দ্রাকে কেন্দ্র করেই নায়ক সুমিত্রের সমস্ত চাওয়া পাওয়া, তাকে নিয়েই তার

নানান কবিতার আসর। সুমিত্র স্বপ্নের মধ্যে তন্দ্রাকে অনুভব করছে— ''যেন স্বপ্নের মধ্যে সুমিত্র দেখলো একটি মুখ, দু'টি ঠোট ইচ্ছায় রক্তিম, দু'টি চোখে স্মৃতির অন্ধকার, স্বপ্নের মতো মুখ, স্বর্গের মতো বুক, স্বর্গের ছায়াপথের মতো বাহু। ছড়িয়ে পড়লো গ্রহতারার গান তার রক্তে, তার যৌবনে, সে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলো না; তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলো, কালো চোখ দু'টি বুজে এলো, ঠোঁট গেলো খুলে, কালো যেখানে বুকের সঙ্গে মিশেছে সেখানটা কাঁপতে লাগলো বার বার, আর বুকের মধ্যে ঢেউ উঠলো কচিপাতা রঙের শাড়িতে।''[২১] কবি মাত্রেই সৌন্দর্যের পূজারী। সুমিত্র ও তাই তার প্রেয়সীর রূপের সাথে প্রকৃতির হাওয়া-আকাশ-বাতাসের তুলনা করেছেন—

''তুমি এই হাওয়া, এই রাত্রি, এই তারা ভরা আকাশ, তোমাকে আমি নিয়েই চলেছি সঙ্গে করে, বুকের মধ্যে ভরে তন্দ্রা, আর কি তোমাকে আমি হারাতে পারি? — গাড়ির জানালায় মাথা রেখে অফুরন্ত রাত্রির স্পর্শহীন রোমাঞ্চে সে আচ্ছন্ন হলো, ঘুমের মধ্যে শান্তি নামলো মনে, ঠোঁটে ফুটলো হাসি। বোজা চোখের অন্ধকার আলো করে তন্দ্রা এসে দাঁড়ালো— দুপুর বেলায় যেমন দেখেছিলো ঠিক তেমনি— সেই কচিপাতা রঙের শাড়ি, ভিজে ভিজে চোখ, কাঁপা কাঁপা বুক কিন্তু স্তব্ধ অধৈর্যহীন...।''[২২]

নায়িকার শাড়ির রং কখনো কচিপাতা আবার কখনো নীল রং ম্লান হওয়ার প্রসঙ্গ বৈষ্ণব পদাবলীর কথা মনে করিয়ে দেয়। যেখানে বৈষ্ণব নায়িকাকে নীল শাড়িতে দেখতে পছন্দ করেছেন বৈষ্ণব কবিরা। বুদ্ধদেবের গল্পগুলোর মধ্যেও অনেক জায়গায় পাই এই নীল ও কচিপাতা রঙের শাড়ির প্রসঙ্গ— ''ঘরে জেগে উঠলো নীল জ্যোৎস্না, ম্লান হলো শাড়ির ঘন-নীল, মুখে নামলো ছায়া,

চোখের কালোতেই চোখ ডুবে গেলো, শুধু ঠোঁট দুটি আকা হয়ে রইলো চাঁদের আলোয়।"[২৩]

"ফিরে তাকিয়ে দেখলো-তন্দ্রা। লম্বা-লাল পাড়ের কচিপাতা রঙের শাড়ি, দাঁড়িয়ে আছে তার স্তব্ধ ঘরটিতে রঙের ঘণ্টা বাজিয়ে।"[২৪]

"নীল শাড়ি তার পরনে, গলায় চিকচিকে সোনা, হাতে রিনিঠিনি চুড়ি, আমি কিছুই বললাম না চুপ করে তাকিয়ে রইলাম শুধু।"[২৫]

ছোট গল্পের পরিসর ছোট, এই ছোট্ট পরিসরেই বুদ্ধদেব বসু নিসর্গের বিরাট পটভূমি সৃষ্টি করেছেন তাঁর সার্বভৌম কবিব্যক্তিত্ব গল্পের নিসর্গশিল্পে সর্বদা ছায়া বিস্তার করে আছে। প্রকৃতি শুধু চরিত্রের অন্তরকে জাগায় না, চরিত্রের সমগ্র অন্তর সত্তাকেই সে গঠন করে, নিয়ন্ত্রণও করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুভা' গল্পে যেমন প্রকৃতি নিজেই এক চরিত্র হয়ে উঠেছে। এই বোবা মেয়ের ভাষা জোগান দেয় প্রকৃতি। প্রকৃতিই সুভার ভাষাবিজ্ঞান। তার অন্তরের ভাব প্রকাশ করার দায়িত্ব নেয় প্রকৃতি। বিরাট প্রকৃতি নানা সংকেত পাঠিয়ে, নানা ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে সুভার ভাষাহীন ভাবকে পরিস্ফুট করে তোলে। নদী তীর, ছায়াঘন উচ্চতট, তেঁতুলতলা, আম কাঁঠাল কলাবাগান, ঘরের বিড়াল শাবক— এই ছিল সুভার জগৎ ও সঙ্গীসাথী। বিরাট আকাশের উদয়াস্তে ও ছায়ালোকে সে অন্তরের ভাষা খুজে পেত। প্রকৃতি আর বোবা মেয়েটি মুখোমুখি বসে থাকত। প্রকৃতি ভাষা-মুখর হয়েছে 'সুভা' গল্পে।

বুদ্ধদেব বসুর গল্পের মতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর গল্পে নিস্বর্গের সাথে মানুষের সম্পর্কের একটা পটভূমি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর গল্পের চরিত্র তাঁর বিরহের বেদনা ও অন্তরের গভীর আকুতি মেঘমল্লারে প্রকাশ করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের

গল্পে বর্ষার লীলা বড় বিচিত্র। 'ছুটি' গল্পে আছে শ্রাবণ-বর্ষা। গ্রাম ছেড়ে শহরে মামার বাড়িতে উঠেছিল ফটিক। তার অন্তরের বেদনা প্রকাশ করেছে শ্রাবণের বর্ষা 'সমাপ্তি' গল্পে বর্ষা-প্রকৃতি পটভূমি রচনা করেছে এবং চরিত্রের মানসলোক ও উদঘাটিত করেছে। বর্ষার ছোট নদীটির বর্ণনা— ''এখন শ্রাবণের শেষে জলে ভরিয়া উঠিয়া একেবারে গ্রামের বেড়া ও বাঁশঝাড়ের তলদেশ চুম্বন করিয়া চলিয়াছে।''[২৬]

'অতিথি' গল্পেও তারাপদর মনের তারগুলি বেঁধেছিল বর্ষা। বর্ষা তাকে উন্মনা ও উতলা করে তোলে। বর্ষার গানে তার হৃদয় ময়ূরের মতো নাচতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের গানে বর্ষা প্রকৃতি বেশি, ছোট গলেপও তাই। বর্ষা তাঁকে বেশি আকর্ষণ করত। কখনো তিনি মেঘমল্লারে গান গেয়েছেন, কখনো গল্প কথায় তাকেই আহ্বান করেছেন।

বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর বিভিন্ন গল্পে নানা সময়ে মেঘ বা বৃষ্টির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। যেমন জ্বর গল্পে রমাকান্তের মুখে বারবার উচ্চারিত হতে শুনি— বৃষ্টির প্রসঙ্গ। এই বৃষ্টিতে ভিজেই তার জ্বর বেঁধেছে। 'মেজাজ' গল্পে ও পাই এই বৃষ্টির একটি সুন্দর আবহ— ''কয়েকদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়ার পর সেই প্রথম রোদ উঠিয়াছে। আকাশ নীল, চমৎকার বাতাস বহিতেছে। বিকাল থেকেই হয়তো আবার বৃষ্টি শুরু হইবে, এবং তিন চারদিন পর্যন্ত আমার হাতে কলম উঠিবে না।''[২৭]

প্রকৃতি মানুষের অনুভূতিতে কখনো উদাসীন থাকে— মানুষের বেদনা তাকে স্পর্শ করে না। মানুষের কাছে প্রকৃতি প্রতিকূল হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের মতো বুদ্ধদেবের গল্পেও সকাল-দুপুর, বিকাল-সন্ধ্যা, রাত্রি, অন্ধকার এবং

জ্যোৎস্নার নানা অনুষঙ্গ এসেছে। নদী-মাঠ-গাছ পালা-লতাগুল্ম, আকাশ-মাটির টান গল্পের নানা জায়গায় অনুভব করা যায়।

শিশুরা মূলত অনুভূতিশীল ও কল্পনা প্রবণ, তারা ভালোবাসে এই দেশ, এই মাটিকে, আর ভালোবাসে প্রকৃতিকে। প্রকৃতির রং রূপ দেখে শিশুদের মন মুগ্ধতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেব বসুর বারোমাসের ছড়াতে রয়েছে প্রকৃতির মনোরম ছবি। টুকরো টুকরো ছবি সাজিয়ে তৈরী হয়েছে চমৎকার এক ছবির মালা— 'আকাশে একটু লাগে নীলের পালিশ/ঝিকমিক রোদ ঠিক টাটকা ইলিশ/রোদের রুপো হলো সোনা একদিন। পূজোর গন্ধ নিয়ে এলো আশ্বিন।'

বুদ্ধদেব বসুর 'চিল্কায় সকাল' খুব পরিচিত কবিতা। চিল্কা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এখানে উল্লিখিত। আরেকটি কবিতা 'চিল্কাতে'। এই কবিতাটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে শিশুমনের গভীর অনুভূতি। চিল্কায় যেন প্রকৃতি উজাড় করা রূপ নিয়ে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অদূরে বিস্তৃত জলরাশি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ট্রেনের সেই চলে যাওয়া বাস্তব থেকে উঠে আসে মনে, মনের মণিকোঠায় রয়ে যায় এক চিরকালীন সম্পদ হিসাবে। সেই অপরূপ দৃশ্যমালা আশ্চর্য সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে বুদ্ধদেবের কবিতায়। অপরূপ দৃশ্যমালা দেখে উন্মুক্ত প্রকৃতির সান্নিধ্যে এসে শিশুমন সেখানেই রয়ে যেতে চেয়েছে, তাই তাঁর কণ্ঠে খুব সঙ্গত কারণেই শোনা যায়— 'যা-ই হোক গে মাগো, আমি এই করেছি পণ। এইখানেতেই কাটিয়ে দেবো সমস্ত জীবন।'

'বুদ্ধদেব বসুর বিভিন্ন সময়ের গল্প-উপন্যাসে তাদের পুরানা পল্টনের টিনের বাড়ির বর্ণনা উল্লিখিত। এই পুরানা পল্টনের প্রকৃতিও বড় বৈচিত্র্যময় এর প্রকৃতিতে আছে নানা ঋতুর পরশ। তাই এর প্রকৃতি বুদ্ধদেবের হৃদয়কে মথিত

করেছে— ''আমার ঘরের বাইরে তুলসীমঞ্চ, পাতার ফাঁকে নীল চোখ মেলে বর্ষায় অপরাজিতা তাকিয়ে থাকে। শরৎকালে উঠোনে ফোটে স্থলপদ্ম, পায়ের ছোঁওয়ায় লজ্জাবতী কুঁকড়ে যায়, ঘাসের সবুজ আর লাল রঙ কোণে জ্বলজ্বল করে। শীতের দিনে শুকনো তুলসী মঞ্জরীর গন্ধ ভাসে হাওয়ায় চৈত্র মাসে বাতাস ছুটে আসে দুদ্দারে।''[২৮]

এখানকার প্রকৃতির অপরূপ মহিমা তার রূপ-গন্ধ নিয়ে বুদ্ধদেবকে একেবারে অজ্ঞান করে রেখেছে— ''ঘরে বসে শুনি শুকনো পাতা ঝরে পড়ে ঝর্ঝর, বর্ষা নামে বিশাল-আকাশ ছেয়ে, প্রান্তর ছেয়ে, পৃথিবী জুড়ে, ধোঁয়াটে নীল কালো মেঘের ভিড়ে নিবিড়— আমাদের টিনের চালে বৃষ্টি পড়ে যেন হাজার সেতারের রিমঝিম বাজনা। বাইরে কাঁচা রাস্তায় কাদা, মাঠে মাঠে ঘাস আরো লম্বা, সব ফোকর ডোবা হয়ে উঠলো, ব্যাঙেদের ফুর্তি অঢেল... কখনো কোনো বৃষ্টি ঘেমে যাওয়া মধ্যরাতে মেঘ ঢুঁইয়ে ঝরে পড়ে জ্যোৎস্না, মাঠের উপর রাত্রি হয়ে ওঠে নীলাভ, আর সবুজ, আর রহস্যময়। কখনো সরারাত বৃষ্টির পরে সূর্য উঠে আসে উজ্জ্বল, নতুন উৎসাহে দখল করে নেয় জগৎটাকে।''[২৯]

এই জায়গাটা তাঁর এতই পছন্দ ছিল যে একদিন তিনি বলে উঠলেন— 'পুরানা পল্টন আজ স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে, তাই তাঁর সমস্ত অপরাধ ক্ষমতা করে শুধু তার সৌন্দর্য্য উজ্জ্বল হয়ে আমার মনে ফুটে উঠছে। ...বাস্তবে যার মধ্যে অনেক অভাব ছিলো, স্মৃতিপটে তার যে ছবি উঠলো, দেখলুম সবচেয়ে সুন্দর কোন জায়গা, আমি অনায়াসে উত্তর দিই : পুরানা পল্টন।' পুরানা পল্টনের টিনের বাড়িতে বুদ্ধদেব ছ-বছর কাটিয়েছিলেন— সমস্ত কলেজ জীবন, সাহিত্য জীবনের

প্রথম পর্যায়, যৌবনের উন্মেষ থেকে বিকাশ এখানেই। তাইতো এই জায়গাটি বুদ্ধদেবের এত প্রিয়, এখানের প্রকৃতির মায়াবী হাতছানিকে তিনি কখনো ভুলতে পারেননি। কত রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে সবুজ বনরেখার উপরে লাল হয়ে চাঁদ উঠতে দেখেছেন, তাঁর মন তখন কবিতার ছন্দে ভরে যেত। একবার এক ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাতে তিনি যেন ঠিক দেখতে পেয়েছিলেন, এক ঝাঁক শাদা মূর্তি মাঠের মধ্যে ছুটোছুটি করছে। তখন তাঁর মনে হয়েছিল তিনি যেন পরির নাচ দেখতে পেয়েছেন।

বুদ্ধদেব বসু অনাবিল ভাষায় তাঁর ছেলেবেলায় ফেলে আসা গ্রামীণ আরণ্যকের রূপকেও আমাদের চেতনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। ক্ষুদ্র এক মফসসল শহর নোয়াখালি, তারও অনেক মনোরম ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন বুদ্ধদেব বসু— ''গাছপালা অজস্র, যেখানে-সেখানে পুকুর, সারা শীত গৃহস্থের উঠোন আলো করে রেখেছে লাল আর হলদে রঙের গাদাফুল, ফুটে আছে পথের ধারে ধারে পাতার ফাঁকে রক্ত লাল জবা আর হলুদ-রাঙা ঘণ্টার মতো টগর, কোনো এক সরকারি আপিশের বাগানে রঙে রং মেশানো বিচিত্র সব পাতা বাহার, চৈত্র মাসে আগুন লাল শিমুল ফেটে গিয়ে ছোটো ছোটো তুলোর বল হাওয়ায় ভাসে। হলুদ আর টকটকে লাল শুকনো পাতার উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ...আছে আকাশ জোড়া ঝিমঝিম জ্যোৎস্না, আর শীতের জ্যোৎস্নায় ঘন কুয়াশার আস্তরণ, যাতে চেনা জিনিষ রহস্যময় হয়ে উঠে, হঠাৎ তাকালে মানুষ বা মানুষের মতো আকৃতি দেখা যায়।''[৩০] সেখানকার প্রসিদ্ধ নদী মেঘনা নদীর কথাও তাঁর মনে পড়ে। যাকে নিয়ে তিনি প্রথম ইংরেজিতে কবিতা লিখেছিলেন, যার নাম Adiu, adieu, Deloney House dear...। 'রজনী হলো উতলা' ও 'সাড়া' উপন্যাসেও এই মেঘনা নদীর প্রসঙ্গ এসছে। তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতিতে পদ্মা নদীও ভেসে উঠেছে—

''বিশাল নদী, ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৃত্যশীল, প্রখর স্রোতে নিত্যযৌবনা— আমি তখনও জানতাম না এত রূপ নিয়েও ইনি নোয়াখালির মেঘনার মতোই ভাঙতে ভালোবাসেন। পদ্মার উপর দিয়ে ধীরে চলেছি গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে— দূর থেকে দেখছি বলে ভিতরকার কোনো কুশ্রীতা চোখে পড়ে না, নাটকের দৃশ্যপটের মতো কোনো জমিদার বাড়ি, কোনো মন্দির চূড়ায় ত্রিশূল, কখনো ঝাঁ-ঝাঁ রোদে বালির উপর দিয়ে মাল্লারা গুণ টেনে চলে, কখনো বিকেলের খেলোয়াড় বাতাসে রঙিন একটা পাল তুলে দেয়। পেরিয়ে যাই অনির্বচনীয়-নির্মল চর মাঝে মাঝে, কোনো কোনোটা এতই ছোটো যেন জলের উপর চিকনপাটি বিছানো। ...একবার নৌকো থেকে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছিলাম— একখানা প্রকাণ্ড নীল আকাশের তলায়, পড়ন্ত বেলার অফুরান রৌদ্র-আমার চোখ দুটো যেন ধাঁধিয়ে গেলো।[৩১] এই ইলিশ মাছের প্রসঙ্গ তিনি উত্থাপন করেছেন তাঁর 'নদীস্বপ্ন' কবিতায়ও—

'ওটা কী? জেলের নৌকো? —তাই তো
জাল টেনে তোলা দায়,
রুপোলি নদীর রুপোলি ইলিশ—
ইশ চোখ ঝলসায়।
ওটা চর বুঝি? একটু রাখোন না!—
এত ভারি সুন্দর,
এ যেন নতুন কার্পেট পাতা—
এই পদ্মার চর?'

বিশাল পদ্মা ও তার রুপোলি ফসল ইলিশকে বুদ্ধদেব হৃদয় মন দিয়ে ভালোবেসেছেন। আর পাশাপাশি মেঘনা নদীর স্তূপীকৃত বাশিরাশি মাছের শুকনো বিবর্ণ আকৃতিহীন জ্বালানি কাঠ সদৃশ শুটকিতে রূপান্তরের দৃশ্যও তিনি ভুলতে পারেন না। তাঁর প্রথম স্মৃতি নোয়াখালির বাগান বাড়িতে অজস্র ফলের সমারোহ

দেখেছেন, এতো প্রচুর ফল যে মেয়েরা ডাবের জলে পা ধোন, পাখিরা ঠুকরে ঠুকরে জামরুল, কালোজাম শেষ করতে পারে না। অপরূপ প্রাকৃতিক পটভূমি সৃষ্টিতে বুদ্ধদেব অতুলনীয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তাঁর 'ইলিশ' কবিতাটির কথা—

''মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে তীরে নারিকেল সারি বৃষ্টিতে ধূমল : পদ্মা প্রান্তে শতাব্দীর রাজবাড়ি বিলুপ্তির প্রত্যাশায় দৃশ্যপট সম অচঞ্চল।'' রাজবাড়ি দেখার দরকার নেই, বৃষ্টির দিনে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ান আপনার পাশোর বাড়িটিই কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া অবস্থায় রয়েছে, এখানেই বুদ্ধদেবের কৃতিত্ব। বুদ্ধদেবের প্রকৃতি-পরিবেশ চেতনা কেবলমাত্র নির্জলা গাছ নদী-আকাশের বর্ণনা নয় এর সাথে সমানভাবে মিশে গেছে মানুষের কথা, তাদের দুঃখ-বেদনার খুশির কথা তাই তো নীল আকাশের নীচে বুদ্ধদেব দেখে ফেলেন কত মৃত্যু, কত নব জন্ম। এই খানেই তিনি যেন আর এক Romantic কবি Shelly-কে ছুয়ে গেছেন। আমাদের মনে পড়ে যায় Shelly-র Prometheus Unburied এর কথা।

বর্ষাকাল আমাদের সবারই প্রিয়, আর এই বর্ষারই অপরূপ ফসল হচ্ছে বৃষ্টি। তিনি তাঁর গল্পগুলোতে বৃষ্টিকে নিয়ে মেতে উঠেছেন, করেছেন বৃষ্টিকে নিয়ে খেলা, বৃষ্টি কখনো মনের আনন্দ তো কখনো দুঃখ প্রকাশ করেছে। যেমন তাঁর 'অভিনয়, অভিনয় নয়' এর 'প্রথম ও শেষ' গল্পের শুরুতেই পাই এই বৃষ্টির প্রসঙ্গ— ''এইমাত্র বেড়াতে বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ এসে গেলো বৃষ্টি। আমার জানালার পাশের পুরোনো পেঁপে গাছটার চিকরিকাটা চিকন পাতাগুলি হাওয়ায় হলে দুলে উল্টে যেতে লাগলো। প্রথমে হীরের কুচির

মতো বড়ো স্বচ্ছ বৃষ্টির ফোঁটা— যেন কতদূর থেকে ছুটে আসতে-আসতে পেঁপে গাছটার উপর মুখ থুবড়ে পড়লো; পরে এলো জাঁক-জমক হাঁকড়াকে পৃথিবীকে অস্থির করে বৃষ্টির মিছিল, সবুজ পাতাগুলো জলের ঝাপটায় কালো হয়ে এলো, বিকেলের প্রচুর আলো কোথায় গেল মিলিয়ে— আকাশ থেকে নদী পর্যন্ত মেঘের ধূসর ছায়া শীত-সন্ধ্যার কুয়াশার মতো ভারি ও ম্লান হয়ে নেমে এসেছে।"[৩২]

'জ্বর' গল্পের রমাকান্তের জ্বর বাধানোর কারণই হচ্ছে এই বৃষ্টি, তাই এই বৃষ্টিকে উদ্দেশ্য করে রমাকান্ত তিক্ত স্বরে বলে— "বৃষ্টিটাই বা কেমন! খানিকক্ষণ হুড়মুড় দুমদাম করিয়া, বলা কহা নাই, আকস্মাৎ একেবারে নীরব, নির্জীব হইয়া গেল,— দেখিতে দেখিতে ভিজা রাস্তার উপর উজ্জ্বল রৌদ্রালোক ঝকঝক করিতে লাগিল; আড্ডায় গিয়া পৌছিতে পৌছিতে রমাকান্তের মুখে বিজয়ের সবল হাসি ফুটিয়া উঠিল।"[৩৩]

গল্পটিতে আবার দেখি রমাকান্তের বৃষ্টির প্রতি অভিমান— "আকাশের এক কোণে বহুক্ষণ হইতেই মেঘ সাজিয়া ছিল, রমাকান্ত রেল লাইন পার হইয়া ডাকবাংলার কাছে আসিতে না আসিতেই যেন তাহাকে জব্দ করিবার জন্য বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। ...আসুক না বৃষ্টি, দেখি কত জোরে আসিতে পারে! তাহার ছাতা আছে বৃষ্টিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সে অগ্রসর হইবে। ছাতায় মাথাটা বাচিল বটে, কিন্তু জলের ঝাপটায় তাহার হাটুর নিচ হইতে পা পর্যন্ত ভিজিয়া গেল।"[৩৪] 'মেজাজ' গল্পটিতেও পাই এই বৃষ্টির প্রসঙ্গ— "কয়েকদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়ার পর সেইদিন প্রথম রোদ উঠিয়াছে। আকাশ নীল, চমৎকার বাতাস বহিতেছে— একটা গল্প লিখিবার মতো সকাল বটে। বিকাল থেকেই হয়তো আবার বৃষ্টি শুরু

হইবে, এবং তিন-চার দিন পর্যন্ত আমার হাতে কলম উঠিবে না। বেচারা গল্প।”[৩৫]

বুদ্ধদেব বসুর একটি অসাধারণ গল্প হলো ‘একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা’। এই গল্পটিতেও বিভিন্ন জায়গায় পাই বৃষ্টির উপস্থিতি— “পরিত্যক্ত চেয়ারটিতে বসে পড়ে মৌলি মন দিয়ে শুনতে লাগল বর্ষার ঝর্ঝর সুর। সে সুর উদ্দাম নয় অর, নয় বন্ধনহীন, বিশ্বজয়ী, এখন তা বিষণ্ণ, নিবিষ্ট, তন্দ্রাভরা। বৃষ্টির বেগ কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার যে হাওয়াটি বইছে, তাতেও আর স্পর্ধা নেই, মত্ততা নেই, তা এখন শান্ত, সজল, এলোমেলো মৌলি ভেবে পেলো না বৃষ্টির কোন রূপটি বেশি সুন্দর— যখন সে হৈ-চৈ করে আসে, না যখন সে ঝোঁকে-ঝোঁকে কেঁদে-কেঁদে বিদায় নেয়।”[৩৬]

‘আদর্শ’ গল্পটিতে চলচ্চিত্র নায়িকা ও তার ব্যর্থ লেখক স্বামী অনিমেষের প্রেমহীন বিমুক্ত জীবনের খণ্ডচিত্র কাহিনীভাগ জুড়ে আছে সেখানে এসে পড়ে তাদের একদা প্রেমপূর্ণ দাম্পত্যপর্বের স্মৃতির ঝলক। দুই নারী-পুরুষের ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব গল্পটির সিংহভাগ জুড়ে আছে। এই গল্পটিতেও বাস্তবের ক্লান্তি দূর করার জন্য বৃষ্টির ঝরো ঝরো শব্দে অনিমেষকে আনন্দ উপভোগ করতে দেখি—

“মাঝে মাঝে যখন বৃষ্টি পড়ে ঝরোঝরো ঝাপসা, ঘর ধূসর, জগৎ লীয়মান, তখন ইজি চেয়ারে বসে বসে আনন্দে সে স্তব্ধ হয়ে যায় হঠাৎ; মনে হয় তার স্বাভাবিক আবাস বুঝি খুঁজে পেল এতদিনে, পাখির যেমন হাওয়া, আর মাছেদের নীল সবুজ চঞ্চল পিছল জল, তেমনি এই বৃষ্টি তার, এই রেখাহীন ধূসরতা, এই নির্বিশেষ বন্য সবুজ, নাস্তিময় আকাশের বিস্তার, এর মধ্যে বেচে তার আনন্দ, শুধু বেচে থেকেই সার্থক সে। কিন্তু এমন একটা সময় আসেই যখন বৃষ্টি থামে, নিষ্ঠুর রৌদ্র আবার ফুটিয়ে তোলে দোকান, বাড়ি, আপিশ, ইশকুল,

ব্যস্ততা— তখন সূর্যের প্রহারে জেগে উঠে তার স্বপ্ন ভেঙে যায়, তাকে মানতেই হয় মানুষের কোন স্বাভাবিক আবাস নেই; মন নামক একটা অস্থির, অনিশ্চিত পরিবর্তমান মণ্ডলের পোকার মতো কোনোরকম আঁকড়ে ঝুলে আছে সে।"[৩৭]

নৈস্বর্গীক সৌন্দর্য বারবারই বুদ্ধদেব বসুর গল্পে কোথাও না কোথাও প্রস্ফুটিতে হতে দেখা যায়। 'প্রশ্ন' গল্পে ভবকুমার তার ছেলের লেখা কবিতা পড়তে পড়তে হঠাৎ এক অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের হাত ছানি অনুভব করে তার মন আনন্দে ভরে ওঠে— ''ভবকুমার আর পড়লো না। খাতাটা বন্ধ করে রেখে দিলো। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলো, শরতের নীল আকাশে বৃহদায়তন সাদা মেঘগুলি পরিতৃপ্তভাবে ঘুরে ঘুমুচ্ছে— তাদের গা থেকে রোদ যেন ফেঁটে বেরোচ্ছে— উজ্জ্বল। সমস্ত আকাশ যেন শান্তিতে, পরিপূর্ণতায় স্তব্ধ, শান্তি অন্তহীন, অবর্ণনীয় শান্তি। পৃথিবীতে এত সৌন্দর্য-অযাচিত, বিনামূল্যে বিতরিত এত সৌন্দর্য, তা যেন বিশ্বাস করা যায় না।"[৩৮]

নৈসর্গিক চেতনা অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রেম আমাদের দেখার দিগন্তকে বিস্তৃত করে দেয়। আসলে প্রকৃতিপ্রেম হচ্ছে 'মনের অবস্থার প্রতিরূপ' একথা পাই আমরা বুদ্ধদেব বসু রচিত অনেক গল্পে। তাঁর গল্পগুলোর মধ্যে খুব সুন্দরভাবে তিনি নিসর্গের সাথে মানুষের সম্পর্কের একটা পটভূমি সৃষ্টি করেছেন।

তথ্যসূত্র

১। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'জ্বর'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-৭

২। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'সুপ্রতিম মিত্র'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-১৬৯

৩। তদেব/ পৃ-১৬৯

৪। নীল পূর্ণিমা/ তদেব/ পৃ-১৫

৫। 'বসুন্ধরা'/ সঞ্চয়িতা/ পৃ-১৮৯

৬। 'জীবনানন্দ দাস/ ধূসর পাণ্ডুলিপি/ কালের পুতুল নিউ এজ সংস্করণ-১৯৫৯/ পৃ-২৯

৭। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'তুলসীগন্ধ'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-১১৩

৮। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা'/ অপ্রকাশিত ১৯৪৫/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-২৬৭

৯। তদেব/ পৃ-২৬৬

১০। তদেব/ পৃ-২৫৭

১১। তদেব/ পৃ-২৫৯

১২। তদেব/ পৃ-২৬৬

১৩। তদেব/ পৃ-২৬৬

১৪। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ তুমি কেমন আছো/ ১৯৬২ অপ্রকাশিত/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-৪২১

১৫। তদেব/ পৃ-৪২২

১৬। তদেব/ পৃ-৪২৪

১৭। তদেব/ পৃ-৪২২

১৮। তদেব/ পৃ-৪২০

১৯। বিদ্যুৎ নীলাঞ্জন/ বুদ্ধদেব বসুর গল্প : অবিরল কবিতার হাতছানি/ 'খাতার শেষপাতা'/ 'বৈশাখী'— পৃ-২২৩

২০। তদেব/ পৃ-২২৮

২১। বসু বুদ্ধদেব/ বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প/ 'জয়জয়ন্তী'/ দেজ পাবলিশিং - ২০০৮/ পৃ-১৮৭

২২। তদেব/ পৃ-১৮৮

২৩। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'একটি কি দু'টি পাখী'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-২৮১

২৪। বসু বুদ্ধদেব/ বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প/ 'জয়জয়ন্তী'/ দেজ পাবলিশিং/ ২০০৮/ পৃ-৩১১

২৫। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'একটি কি দু'টি পাখী'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-২৮১

২৬। পাল নিমাই চন্দ্র/ গল্পগুচ্ছ কবির কথাশিল্প/ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— 'সমাপ্তি'/ শক্তিপদ আড্ডু/ নভেম্বর, ১৯৯৯/ পৃ-৩৪

২৭। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'মেজাজ'/ 'রেখাচিত্র' ১৯২৮/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-১২

২৮। মজুমদার সমীরণ (সম্পাদিত)/ আমাদের বুদ্ধদেব/ অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ/ কলকাতা পুস্তকমেলা ২০০৯/ পৃ-৩৭

২৯। তদেব/ পৃ-৩৭-৩৮

৩০। তদেব/ পৃ-৩৮

৩১। তদেব/ পৃ-৩৮

৩২। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'অভিনয়, অভিনয় নয়' এর 'প্রথম ও শেষ'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-১৭

৩৩। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'জ্বর'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-২

৩৪। তদেব/ পৃ-২

৩৫। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'মেজাজ'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-১২

৩৬। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-২৭৩

৩৭। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'আদর্শ'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-৪১৫

৩৮। বসু বুদ্ধদেব/ ভাসো আমার ভেলা/ 'প্রশ্ন'/ এবং মুশায়েরা/ ২০১০/ পৃ-৭৮